একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Religious Conversion of Indigenous Tribes of East Burdwan: A Sociological and Literary Review Based on Field Research

পূর্ব বর্ধমানের আদিবাসী জনজাতির ধর্মান্তরকরণ: ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর একটি সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যালোচনা

Name of the Author: **Uday Bagdi**

Affiliation: **SACT-I, RANIGANJ GIRLS' COLLEGE**
RANIGANJ, PASCHIM BARDHAMAN,
WEST BENGAL, 713358.

Abstract: The history of the indigenous people of India is hidden in the non-Aryan history. With the arrival of the Aryans, the indigenous people living in this land gradually retreated and took refuge in the mountains and forests. They later became known as the Tribes. These people, living far from their homeland, have developed their own culture, society, customs, and manners in the privacy of the forests. But after the arrival of the British, in addition to restricting their habitat, forest rights, and social customs, the British government has also focused on their long-standing traditional religion. The process of converting the indigenous community to Christianity began from the very beginning of the British arrival. Although the missionaries' aim at that time, along with the propagation of religion, was the spread of imperialism. Later, this aim changed. But the process has remained alive in the same way. It is from this source that my discussion has shown an overall picture of how Christianity is spreading among the various indigenous people of East Burdwan. The reasons for this have been highlighted through field survey.This discussion also considers how this issue is being portrayed in the realm of Bengali Literature.

Keywords: *Adibasi Community, Missionaries, Religious Conversion, Literature.*

পূর্ব বর্ধমানের আদিবাসী জনজাতির ধর্মান্তরকরণ: ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর একটি সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যালোচনা

উদয় বাগদি

বর্তমান ভারতের চালিকাশক্তির মূল ধারায় যারা আছেন নৃতত্ত্বের বিচারে তারা এ ভূখণ্ডের আদিম জনজাতি নয়। আদিম বলতে বর্তমানে যাদের আদিবাসী (tribe)বলে চিহ্নিত করা হয় তাদের অবস্থান কতকটা পথপার্শ্বে অতিচেনা ফুলের মত। বিচ্ছিন্নতাই যাদের বিশেষত্ব দিয়েছে। আধুনিক সভ্যতার প্রথম সারির জনগোষ্ঠীর নাগরিক তারা নয়। বরং একেবারে পিছন সারির সংরক্ষিত নরগণ তারা। আদিবাসী শব্দটির প্রতিশব্দ (tribe) কথাটির উৎস ল্যাটিন শব্দ (Tribes), যার অর্থ হল একই বংশধারার ধারাবাহিকতা নিয়ে বসবাসকারী এক গোষ্ঠী। এদেশে শাসনপর্বে ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য জীবনের মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে থাকা পাহাড়-পর্বত , বন-জঙ্গলে বসবাসকারী নিজস্ব রীতিনীতি , আদব-কায়দায় স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে 'Tribe'শব্দের চিহ্নিত করে।নৃবিজ্ঞানী ড: রিভার্স (Rivers) বলেছেন –"তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই ,যারা এখনও একই ভাষা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে , যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে , নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকে "।[১] অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (D.N. Majumdar) বলেছেন - "আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার, যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রূপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধে মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সমঞ্জস্য ও আদান-প্রদান করে থাকে"।[২]

২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ আদিবাসী মানুষের বসবাস। আর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে আদিবাসী সমাজভুক্ত মানুষের সংখ্যা ৫.৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে আছে আদিবাসী জনজাতির মানুষ।একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যাকে নিচে দেখানো হলো –

জেলার নাম	মোট আদিবাসী জনসংখ্যা
বর্ধমান	৪৮৯,৪৪৭
উত্তর ২৪ পরগনা	২৬৪,৫৯৭
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৯৬,৯৭৬
পশ্চিম মেদিনীপুর	৮,৮০,০১৫
পূর্ব মেদিনীপুর	৩,৫৫৫
মুর্শিদাবাদ	৯১,০৩৫
হুগলি	২২৯,২৪৩
নদীয়া	১৪০,৭০০
হাওড়া	১১,০৬৯
কলকাতা	১০,৬৮৪
মালদা	৩০৮,৮৫০
জলপাইগুড়ি	৭৩১,৭০৪
বাঁকুড়া	৩৬৮,৬৯০
বীরভূম	২৪২,৪৮৪
পুরুলিয়া	৫৪০,৬৫২
উত্তর দিনাজপুর	১৬২,৮১৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	২৭৫,৩৬৬
কোচবিহার	১৮,১২৫
দার্জিলিং	৩৯৭,৩৮৯

- **২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গর জেলা ভিত্তিক আদিবাসী জনসংখ্যা**

আদিবাসী জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্ধমান জেলা রাজ্যের প্রথম সারির দিকেই আছে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এই জেলাকে ২০১৭ সালে ৭ এপ্রিল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা আর পশ্চিম বর্ধমান জেলা। আমার আলোচনার জায়গা পূর্ব বর্ধমান। এই জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ৩ ,২৭,৫০১ জন। যা মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৬.৭৭ শতাংশ।

ব্লকের নাম	আদিবাসী জনসংখ্যা	ব্লকের নাম	আদিবাসী জনসংখ্যা
আউসগ্রাম ১	১৫,৫৭৭	মেমারি ২	২৭,৬৭৬
আউসগ্রাম ২	২১,৭৫৯	কালনা ১	২০,৯৬২
ভাতার	২৫,৬২৬	কালনা ২	২৮,৯৩০
বর্ধমান ১	১২,১২৭	মন্তেশ্বর	৬,৯৫৮
বর্ধমান ২	১৮,২৪২	পূর্বস্থলী ১	৭,৬০৮
গলসি ১	৭,৬৫২	পূর্বস্থলী ২	৭,৯২০
গলসি ২	১০,০৫৯	কাটোয়া ১	২,৫০৬
জামালপুর	৪০,৪৩২	কাটোয়া ২	১,৯৬৩
খন্ডঘোষ	৪,৩৪৫	কেতুগ্রাম ১	১,০২৫
রায়না ১	১০,৫০৩	কেতুগ্রাম ২	৬৯২
রায়না ২	৬,০৬২	মঙ্গলকোট	৭,৪৬২
মেমারি ১	৩৪,৪৬৭		

- **পূর্ব বর্ধমানের ব্লক অনুযায়ী আদিবাসী জনসংখ্যা**

এই অঞ্চলে যে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি দেখা যায় সেগুলি হল - সাঁওতাল , মুণ্ডা, কোড়া, মাহালি, ওঁরাও, ভূমিজ প্রভৃতি।এদের মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশি। পরিচিতিতে আদিবাসী হলেও প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজস্ব সমাজ গঠনে, আদব কায়দায়, কর্মপদ্ধতির বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল -

সাঁওতাল

"সাঁওতাল পুরান সংগ্রহক ক্রেফস রুড সাহেবের মতে , সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবত 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এ দেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করে। আগে প্রাচীন মেদিনীপুরের এক অংশকে বলা হলো 'সাওন্ত' বা 'সামন্তভুমি'। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে , শব্দটি এসেছে সম্ভবত সাংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। সামন্তপাল মানে 'সীমান্ত রক্ষক '। মধ্যযুগে এই সামন্তপাল কথাটিইপরে সামন্ত-আল ও পরেসাঁওন্তাল সাঁওতাল পরিণত হয় "।[৩]সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মুন্ডারী শাখার ভাষা। পূর্ব বর্ধমান শুধুই নয় , পশ্চিমবঙ্গে কথ্যভাষা হিসাবে বহুল ব্যবহৃত ভাষা রূপে বাংলার পরের স্থান সাঁওতালির। সাঁওতালি ভাষা অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন হরফ যেমন , রোমান, বাংলা, নাগরী ও অলচিকি ব্যবহার করা হয়। তবে এদের মধ্যে রোমান হরপের ব্যবহারই বেশি। বাসস্থান হিসাবে এই গোষ্ঠীর মানুষ জঙ্গলকেই নির্বাচন করে। সাঁওতালদের ঘরবাড়ি আলাদা বিশেষত্বের দাবি রাখে। ঘরের

দেওয়ালের গায়ে প্রাকৃতিক রং দিয়ে আঁকা ছবি তাদের শিল্পসত্তা আর মন সুষমার পরিচয় বহন করে। মারাঙবুরু, জাহের প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনার জন্য গ্রামের বাইরে নির্মাণ করা হয় 'জাহের থান'। গ্রামের সমস্ত মানুষজন চৈত্র মাসের সারহুল উৎসবের সময় একত্রিত হয় এই পবিত্র স্থানে। সাঁওতাল গ্রামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল 'মাঝি থান'। প্রধানের বাড়ির আশেপাশেই নির্মাণ করা হয় এই স্থান। সাঁওতালিদের বিশ্বাস চার পুরুষের আত্মা থাকে এই স্থানে। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামে নিজস্ব পঞ্চায়েত থাকে। গ্রামের সমস্ত সম্মিলিত কাজকর্ম, অনুষ্ঠানের দিন ধার্য, বিবাদ মীমাংসার মত প্রশাসনিক কাজ এই পঞ্চায়েত করে থাকে। এছাড়াও মাঝি (গ্রাম প্রধান) , পারানিক (মাঝির সহায়ক) , জগ মাঝি (যুবক যুবতীদের পরিচালক) , জগ পারানিক (জগ মাঝির সহায়ক) গোডেত (মাঝির বার্তাবহ), নায়কে (গ্রামের পূজারী), কুড়াম নায়কে (নায়কের সহায়ক) প্রকৃতি পদাধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রাম পরিচালিত হয়। গ্রাম সংগঠনের নির্দেশ না মেনে চললে তাকে জাতিচ্যুত 'বিটলাহা' পর্যন্ত করা হয়। সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা হলো 'মারাঙ বুরু '। প্রত্যেক উৎসবেই তারা এই দেবীর পূজা দেয়। তাদের অন্য এক উপাস্য দেবতা হলো 'সিঙ বোঙ্গা'। অরণ্যচারী এই মানুষজনকে সিঙ বোঙ্গা বা সূর্য দেবতাই রক্ষা করে বলে তাদের বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাস , কুসংস্কার এই সমাজে সমানভাবে বহমান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ , জ্বরা, প্রকোপের পিছনে কোনো অপশক্তির অসন্তুষ্টির বিশ্বাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যায়। তাই এই শক্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ লক্ষণযুক্ত গৃহপালিত প্রাণী উৎসর্গ করা হয়। গৃহে পালিত প্রাণী থাকলে ভালো , না থাকলে প্রকৃতিনির্ভর আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষজনের কাছে সমাজ নির্দেশিত নিদান বোঝা হয়ে চেপে বসে। সাঁওতালিদের জীবিকা মূলত কৃষিকাজ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ। এই কাজে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। তবে বর্তমান সময়ে এই ছবির অনেক বদল হয়ে গেছে। শিক্ষাকে, ধর্মকে আশ্রয় করে এই গোষ্ঠীর অনেক মানুষজন বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম বদলে ফেলেছে নিজেদের জীবন পথ।

মুণ্ডা

'মুণ্ডা' শব্দটি সম্ভবত 'মুন্ড' শব্দ থেকে এসেছে। 'মুণ্ড' মানে 'মাথা'। চলতি কথায় এখনও গ্রামের মাথা বলতে গ্রামের প্রধান বা মোড়লকে বোঝায়। মুণ্ডা জাতির উৎস সম্পর্কে খোঁজ করলে জানা যায় যে , তারা মূলত এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদি-অষ্ট্রাল শ্রেণী থেকে , যাদের বলা হত 'মুরা বা হোরোহন '।[৪] নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের বিবরণে পাওয়া যায় যে , 'মুণ্ডা'রা প্রথম উত্তর-পশ্চিম ভারতের বসবাস করত। আর্যদের প্রবেশের পর ভারতের এই অন্যতম আদিবাসিন্দা অনার্যরা আজমগড়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে বেশীদিন তারা থাকতে পারেনি। আজমগড় ছেড়ে তারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে। এ অঞ্চলটি ছিল পাহাড়ে ঘেরা ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ তারা জঙ্গল কেটে প্রথম বসতি স্থাপন করল। এদের আদি বাসস্থান ছোটনাগপুর হলেও সময়ের সাথে সাথে তারা রাঁচি, পালামৌ, ধানবাদ, পূর্ণিয়া, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পরে। মুণ্ডারা সাধারণত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই গ্রাম পত্তন করে। গ্রামের মাঝখানে থাকে 'আখড়া'। এই স্থানেই গ্রামের ছেলে মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ-গান করে। সাঁওতালদের 'জাহের থান' এর মতই মুন্ডাদের থাকে 'সারনা'। গ্রামের বাইরে এখানে আরাধ্য দেব দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি দেওয়া হয়। গ্রামের এক প্রান্তে

অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মাণ করা হয় 'ঘুম ঘর'। মুন্ডারীরা একে বলে 'গীতি ওড়া'। এখানে ছেলেরা তাদের জাতির অতীত ইতিহাসের গল্প , বর্তমান সমাজের রীতি-নীতির সাথে পরিচয় লাভ করে। মুণ্ডা সমাজ নিজস্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পঞ্চায়েতের তিন স্তম্ভ হলো মুণ্ডা (গ্রাম প্রধান) , পাহান (পুরোহিত) এবং মাহাতো (বার্তা বাহক)। যে গ্রাম পত্তন করে তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে প্রধান হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এই প্রধানকে বলা হয় মুণ্ডা। বংশানুক্রমে এই পদ অর্জিত হয়। চাষবাস এবং শিকার মুণ্ডাদের প্রধান জীবিকা। মেয়ে পুরুষ সকলেই এই কাজ করে থাকে। যাদের নিজস্ব জমি থাকে না তারা ক্ষেতমজুর, দিনমজুর করে দিন গুজরান করে।

মাহালি

সাঁওতালদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা হলো মাহালি। আদিবাসী বসবাসকারী অঞ্চলে এদের বসবাস। তবে এরা আলাদাভাবে নিজেদের গ্রাম নির্মাণ করে না। সাধারণত সাঁওতাল গ্রামের পাশেই নিজেদের ডেরা বাঁধে। পাশাপাশি বা প্রায় একই গ্রামে বসবাস করলেও মাহালিদের নির্মিত ঘর সাঁওতালদের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। দেওয়ালের শিল্পকলা মাহালীদের বাড়িতে থাকে না। বাঁশের নানা জিনিসপত্র তৈরি করা এদের প্রধান জীবিকা। এর পাশাপাশি চাষবাস ও দিনমজুর করেও সংসার নির্বাহ করে। মাহালি সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার যে গোষ্ঠীর পাশে বসবাস করে সেই গোষ্ঠীর গ্রাম পরিচালনার কাঠামো দ্বারা নিজেদের কাজ চালিয়ে নেয়। নিজস্ব কোন পরিচালন ব্যবস্থা তারা তৈরি করে না। এই সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হয় আবার কবরও দেওয়া হয়। মহালিরা সি ঙবোঙ্গা অর্থাৎ সূর্যদেবের উপসনা করে। তবে প্রত্যেক মাহালি পরিবারে নিজস্ব গৃহ দেবতা 'অড়া: বোঙ্গা' থাকে।

ওরাওঁ

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায় হল ওরাওঁ সম্প্রদায়। এদের নিজস্ব ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 'কুড়ুম' হলেও বর্তমানে বাংলা মিশ্রিত 'সাদরি' ভাষাতে কথা বলে। গ্রাম প্রধানকে এই সমাজে বলা হয় 'মাহাতো'। পুরোহিতকে বলা হয় 'পাহান'। অশরীরী আত্মার অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্তি পেতে পাহানের আশ্রয় নেয়। জীবিকার দিক দিয়ে এরা মূলত কৃষিজীবী। যাদের জমি নেই তারা অন্যের জমিতে মজুরির কাজ করে। বর্তমানে এই সমাজে পশুপালনের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। অবসর সময়ে দলবদ্ধভাবে শিকারে যাওয়া এই সমাজের রীতির সমান।

ভূমিজ

আদিবাসী সমাজ নিজের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে সংরক্ষণে সদা তৎপর হলেও কিছু কিছু গোষ্ঠী সময়ের সাথে সাথে সহাবস্থানের ফলে হিন্দু প্রভাব সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভূমিজ গোষ্ঠী এদেরই অন্যতম। ভূমিজরা পূর্বে মুণ্ডাদেরই একটি শাখা ছিল। ১৮৩২-৩৩ সালে 'গঙ্গানারায়ণী বিক্ষোভ' দিয়ে ইতিহাস ভূমিজদের স্মরণীয় করে রেখেছে। মানভূমে ভূমিজদের বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এক সময় ভূমিজদের ভাষা মুন্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সচেতনতার অভাবে তা হারাতে বসেছে। শুধুমাত্র ভাষায় নয়, নিজেদের সংস্কৃতি, রীতিনীতিও ক্রমশ বিস্তৃত হতে চলেছে একই কারণে। নিজেদের আদিবাসী

পরিচয় দিতে কোথাও না কোথাও তারা দ্বিধাবোধ করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহের পর ছেলেমেয়েরা আলাদা হয়ে যায়। বাল্যবিবাহ এ সমাজে নেই। বিবাহযোগ্য হলে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও থাকে। ভূমিজরা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্ম মেনে চলে। তাই হিন্দুদের দেবদেবী এই সমাজের সহজেই চোখে পরে। পাশাপাশি তারা সি ঙবোঙ্গার পূজা করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে ভূমিজরা জমিদারদের পাইক বরকন্দাজের কাজ করত। সেই সূত্রে তারা নিষ্কর জমির উপস্ব ত্ব ভোগ করতো। তাই কৃষিকাজ এদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু বর্তমানে এদের অবস্থা অনেকটা পড়ে গেছে।

এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের পেশা বা জীবিকা পর্যালোচনা করলে দেখি স্থায়ী অর্থকারী কোন পেশার সাথে তারা সরাসরি যুক্ত নয়। ফলত আর্থিকভাবে এই সমাজ এখনো নির্দিষ্ট কোন দিশা পায়নি। এর উপর আছে নিজস্ব সমাজে প্রচলিত কিছু রীতিনীতির অনভিপ্রেত চাপ। এসমস্ত কিছু থেকে মুক্তির পন্থা হিসাবে এদের মধ্যে অনেকেই বেছে নিচ্ছে ধর্মান্তরের পথ। বিশেষ করে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে নিজেদের যুক্ত করে নিচ্ছে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজ সংস্কৃতিকে পাশে রেখে। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে যে তাহলে আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম কি ? এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ বলেছেন –"ভারত গভর্নমেন্টের সেন্সাস বা আদমসুমারিতে ধর্ম অনুসারে জনসংখ্যা গণনার চেষ্টা হয়ে থাকে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান , বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমাজের জনসংখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের ধর্ম কি ? ভারত গভর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা খোঁজ না করে 'অ্যানিমিজম' (Animism) কথাটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সব আদিবাসীকে এই এক 'ধর্মমতের' কোঠায় তালিকাভুক্ত করেছেন। অ্যানিমিজমের অর্থ 'জড়োপাসনা'বা 'ভূতপূজা' বা 'প্রেতবাদ'। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে সরাসরি এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া এই আখ্যা দিলে হিন্দুসমাজের ধর্মমত থেকে তাদের পার্থক্যও ঠিক বোঝা যায় না; কারণ অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা বা প্রেতবাদ বলতে যা বোঝায় , তা হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণীর ধর্মচরণের মধ্যেও মিশে রয়েছে। সুতরাং এ ধারণা মিথ্যে নয় যে , আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে জড়োপাসক সংজ্ঞাটি কিছুটা জবরদস্তি করেই চাপানো হয়েছে "।[৫]১৯৩১ সালের সেন্সাস কমিশনার ডা: জে. এইচ. হাটন (Dr. J. H. Hutton) 'উপজাতীয় ধর্মসমূহ' (Tribal Religions) নামে একটা বর্গ কল্পনা করে আদিবাসীদের তার তালিকাভুক্ত করবার একটা চেষ্টা করেন। নির্দিষ্ট কোন একটা ধর্মের কথা না বলে তিনি 'ধর্মসমূহ' কথাটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ 'বিশিষ্ট একটা ধর্ম 'নয় উপজাতীয়দের ধর্ম অনেকগুলি। "অতীতে একসময় অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রলয়েড সংস্কৃতি এক বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট দর্শন ও সত্যিকারের ধর্মচরণ ('a real religious system and a definite philosophy') দেখা দিয়েছিল, বর্তমান আদিবাসীদের ধর্ম তারই ধ্বংসজনিত আবর্জনার মত টুকরো টুকরো নিদর্শন"[৬]

ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য আমি যে অঞ্চলগুলোকে নির্বাচন করেছি সেগুলি হল -

১) আউসগ্রাম-২ ব্লকের অন্তর্গত দেবশালা গ্রামপঞ্চায়েতের নতুনবাঁধ গ্রাম।

২) কাটোয়া- ১ ব্লকের অন্তর্গত শ্রীখন্ড এলাকার গাঙ্গুলীডাঙ্গা গ্রাম।

৩) কালনা-২ ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়বহরকুলি গ্রাম

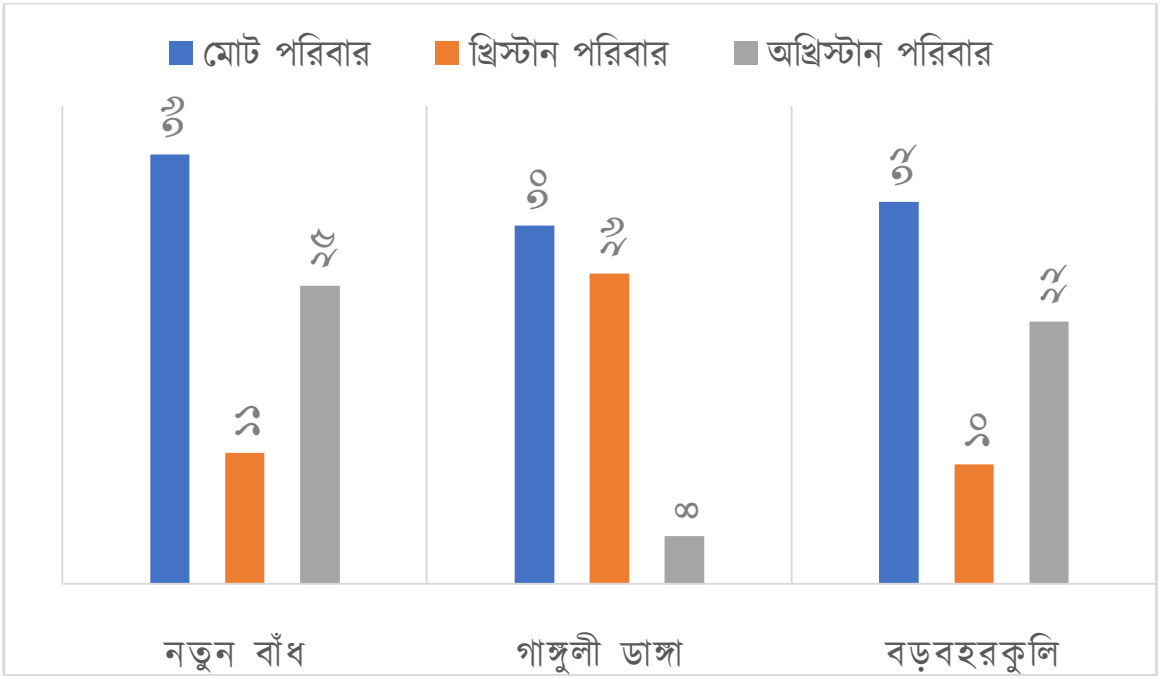

- **নতুনবাঁধ, গাঙ্গুলীডাঙ্গা, বড়বহরকুলি গ্রামের খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান পরিবারের রেখাচিত্র (ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)**

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকেএই অঞ্চলে আদিবাসীদের ধর্ম পরিবর্তনের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে সেগুলিকে নিচে আলোচনা করা হলো –

অর্থনৈতিক কারণ

পূর্ব বর্ধমানের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনবাঁধ গ্রাম , কাটোয়ার শ্রীখন্ডের গাঙ্গুলীডাঙ্গা , কালনার বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বহরকুলি গ্রামে মানুষের সাথে সাক্ষাত সূত্রে উঠে এসেছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখানোর পিছনে অর্থনৈতিক কারণে প্রসঙ্গ। নতুনবাঁধ গ্রামের লক্ষী হেমরম (নাম পরিবর্তিত) পনেরো বছর বয়সে ধর্ম বদল করেছে। যদিও এই সিদ্ধান্ত ছিল পারিবারিক। আর বিস্তারিত পরিসরের দেখলে বোঝা যায় তা ছিল গোষ্ঠীগত। একসাথে দেড়শো জনের বেশি মানুষকে একসাথে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে সে তার পরিবারের সঙ্গীন আর্থিক পরিস্থিতির কথাই বলেন। ধর্ম গ্রহণ করার পর চার্চের সহায়তায় সে পড়াশোনা করে। পরে চার্চের ব্যবস্থাপনায় গ্রামের বয়স্ক মহিলাদের পড়ানোর জন্য চার্চ থেকে প্রতি মাসে দু হাজার টাকা পেয়েছে। এছাড়া বিপদে-আপদে চার্চের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে কখনো সে নিরাশ হয়নি। শ্রীখন্ডের গাঙ্গুলিডাঙ্গা গ্রামের নিমেশ্বর মুর্মু (নাম পরিবর্তিত) তার পরিবারের সাথে নয় বছর বয়সে ধর্ম বদল করেছে। আজ সে উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ব বর্ধমানের লাকুরডি জলকল এলাকায় ‘মিশনারি সব চ্যারিটি স্নেহ সদন’-এ সে কর্মসূত্রে যুক্ত মাসিক বারো হাজার টাকা বেতনে। বড়বহরকুলি গ্রামের অসীম হেমরম (নাম পরিবর্তিত) ধর্ম পরিবর্তনে এই অর্থনৈতিক সুবিধার কথাই বলেছেন।

শিক্ষাগত কারণ

ক্ষেত্র সমীক্ষায় ধর্মান্তরিত পরিবারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে তারা আজ থেকে কুড়ি বা তারও বেশি বছর আগে নিজেদের ধর্ম বদল করেছে। আমরা অনুমান করতে পারি আজ থেকে এত বছর আগে একটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের শিক্ষার চিত্রকে। খুব একটা ভালো ছবি আমাদের কল্পনায় আসবে না। সেই জায়গা থেকে আদিবাসী সমাজের অনেক পরিবার নিজের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। নিমেশ্বর মুর্মু সে তার পড়াশোনা যাবতীয় খরচ চার্চের স্পন্সরশিপের দ্বারা পেয়েছে। অসীম হেমরম সে ইংরেজি মাধ্যম সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছে। খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষিত হওয়া পরবর্তী প্রজন্ম শেফালী টুডু তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ এবং আবাসিক খরচ সাহেবডাঙ্গা চার্চ থেকে পেয়েছে। এ কথা মানতেই হবে যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরামর্শ ও সাহায্য তারা পেয়েছে লোকালয় দূরবর্তী আদিবাসী সমাজে থেকে তো সম্ভব হত না।

সামাজিক বিধানজনিত কারণ

সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্খাইম (Emile Durkheim) সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা আলোচনার সূত্রে বলেছেন – "সামাজিক ঘটনাবলী ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা (constraint) বিস্তারে সক্ষম। অর্থাৎ সামাজিক ঘটনাবলী ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সামাজিক বস্তুসত্যের অস্তিত্বের জন্যই ব্যক্তি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সামাজিক আচরণ করতে প্রণোদিত হয়। সামাজিক ঘটনাবলীর দমনমূলক ক্ষমতা আছে যার দ্বারা এরা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এদের অগ্রাহ্য করে ব্যক্তির পক্ষে তার খুশীমতো কিছু করা সম্ভব নয় "।[৭] সমাজের রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যই একটি সমাজের গোষ্ঠী বন্ধনের দৃঢ়তাকে নির্দেশ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সমাজ নির্দেশিত নিদান মানুষের ওপর অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলত তারা সিদ্ধান্ত নেয় অন্যরকম। নতুনবাঁধ গ্রামের সুশীল মুর্মু (নাম পরিবর্তিত) ধর্ম পরিবর্তনের কারণ হিসাবে এই সামাজিক নির্দেশকেই দায়ী করেছেন। সে এবং আরও কয়েকটি পরিবার মিলে একসাথে আলোচনা করে ধর্ম পরিবর্তনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এর পেছনে ছিল নিজেদের সমাজ পরিচালিত কুসংস্কার, ডাইনি প্রথার মত অন্ধবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া। সাঁওতাল সমাজে বিশ্বাস করা হয় , কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পেছনে ডাইনির মত কোন অপশক্তি ছায়া আছে। তাই তাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। তাই সমাজ বিশেষ লক্ষণযুক্ত ছাগল, হাঁস, মুরগি (যেমন, সাদা ছাগল, সাদা মুরগি) বলি দেওয়ার নিদান দেয়। প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে ওঠা এই সাঁওতাল সমাজে এমন বিশ্বাস সঙ্গতিহীন মনে হয় না। এমনকি বলি দেওয়ার নির্দেশে কোন কারণ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যে পরিবার বা ব্যক্তির উপর এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে সে দিশাহীন হয়ে পড়ে নিজ সমাজ নির্ধারিত সিদ্ধান্তে। অনেক সময় সমাজের দাবীকে মেটাতে নিজের শেষ সম্বল চাষযোগ্য জমিকে বন্ধক দিতে বা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন চলে আসা মানসিক সমর্থনহীন এই নিদারুণ রীতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ নির্দেশ করছে চার্চের ফাদার, সিস্টার। বিনিময়ে খ্রিস্টান ধর্মের গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা।

দুই ধর্মের নমনীয়তা ও সহাবস্থান

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের অন্য একটি কারণ হলো আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও খ্রিস্টান ধর্মের নমনীয়তা। এই প্রসঙ্গে নতুনবাঁধ গ্রামের গ্রাম প্রধানের বক্তব্য হল - গ্রামে যারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করছে তাদের সাথে সাঁওতাল সমাজের কোন বিরোধিতা নেই। একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারলে , চলতে পারলে কোন অসুবিধা নেই। অপরপক্ষে গ্রামের খ্রিস্টান পরিবার স্বচ্ছন্দে নিজেদের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে পারছে। দুই ধর্মের সহবস্থানে কোথাও কোন সমস্যা তৈরি হচ্ছে না। খ্রিস্টান অখ্রিস্টান পরিবার একসাথে পারস্পরিক উৎসব আনন্দে শামিল হচ্ছে। ফলে আদিবাসী খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যে চরমভাবে এই বোধ কাজ করছে না যে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তবে তফাত যে কোথাও একেবারে হচ্ছে না এমনও নয় । আদিবাসী খ্রিস্টান পরিবারগুলিকেচার্চকতগুলি নিয়ম পালনের কথা বলছে । যেমন, বাড়িতে বাইবেল রেখে দিনে অন্তত দুবার প্রার্থনা করা , একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে নির্মিত উপাসনালয়েএকত্রিত হয়ে যীশুর উপাসনা করা , প্রত্যেক রবিবার চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করা । ফলে খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষিত আদিবাসী পরিবার কতগুলো নতুন নিয়মের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে মনে হয়েছে চার্চ একেবারে সুপ্তভাবে আদিবাসীদের তাদের নিজস্ব পূজা পদ্ধতি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করছে। আদিবাসী পরিবার 'জাহের থান ', 'মাঝি থানে 'পুজো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু পূজ্য দেবদেবীকে তারা প্রণাম করছে না এবং পূজোর প্রসাদ তারা খাচ্ছে না। এতদিন যে দেবদেবী ছিল তাদের প্রজন্মসূত্রে একেবারে নিজস্ব তাই হয়ে যাচ্ছে অন্য ধর্মের নির্দেশে আলাদা। ফলে আদিবাসী সমাজের নিজস্বতা, মৌলিকতা কোথাও না কোথাও নিজ সমাজে অবস্থিত ধর্মান্তরিত মানুষের দ্বারাই ক্রমশ বিপন্নতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি টান ধর্মান্তরি ত আদিবাসীদের কেউ অনুভব করছে আবার কারও মনে এমন প্রশ্ন তৈরিই হচ্ছে না। অসীম হেমরমকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে সে বলে , আজ ধর্মান্তরি হওয়ার এত বছর পর তার মনে এই প্রশ্নটা তৈরি হয় যে কেন সে ধর্ম পরিবর্তন করেছিল ? এই প্রশ্ন তার চিন্তায় বেশি করে আসে যখন সে দেখে নিজস্ব সংস্কৃতিকে অন্য ধর্মীয় অনুশাসনে কাটছাট হতে। পরমহুর্তেই তার মনে এই কৃতজ্ঞতার বোধ তৈরি হয় যে সেদিন চার্চ পাশে না থাকলে আজ সে এত দূর পড়াশোনা করতে পারত না। এই দোলাচলতা বা টানাপোড়েন ধর্মান্তরি প্রজন্মের মধ্যে থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মে কমে যাচ্ছে। আদিবাসী সংস্কৃতি তখন তার কাছে হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র বিনোদনের উপকরণ। জন্মসূত্রের পাওয়া ধর্মের সাথে তৈরি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক যোগ ও ধর্মীয় ভাবানুভূতি। আর যারা শিক্ষাসূত্রে বা কর্মসূত্রে নিজস্ব গ্রাম থেকে , সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে থাকছে তারা অনুসরণ করছে কেবলমাত্র নবদীক্ষিত ধর্মের অনুশাসনকে। এই দূরত্ব শুধু নিজস্ব গ্রাম থেকে কর্মস্থল বা শিক্ষাস্থলের নয়। এ দূরত্ব নিজ গোষ্ঠীধর্ম থেকে সরে যাওয়া দূরত্বের সমানুপাতিক।

শুধুমাত্র আদিবাসী দের ধর্মের উদারতা নয় মিশনারীদের খ্রিস্টান অখ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনুভবময় আচরণ কোথাও না কোথাও সহজ সরল এই মানুষদের মনে ভরসার জায়গায় তৈরি করছে। তবে মিশনারীদের এহেন আচরণ পরাধীন ভারতে ছিল না। ইংরেজ আধিপত্য

প্রসারের হাত ধরে ভারতে শুরু হয় খ্রিস্টধর্ম প্রচার। খ্রিস্টান ধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রচারের পাশাপাশি তখন মিশনারীদের মনে কাজ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য, তাদের আচরণে বহুবদল হয়ে গেছে। এখন মিশনারীরা অনেক বেশি আন্তরিক। খ্রিস্টান অখ্রিস্টানদের প্রতি ব্যবহারে তারা বৈষম্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দুর্গাপুরের 'মাদার টেরেসা মিশনারী অফ চ্যারিটি'সংস্থা প্রত্যেক মাসে নতুনবাঁধ গ্রামে এসে যে ওষুধ , পোশাক বিতরণ করে তা শুধুমাত্র খ্রিস্টান পরিবারের জন্য নয়। অখ্রিস্টান পরিবারগুলিও সমানভাবে উপকৃত হয়। অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্খাইম (Emile Durkheim) ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে যে 'পার্থিব' (profane) বিষয়বস্তুর কথা বলেন , প্রথম প্রজন্মের ধর্মান্তরিত আদিবাসীরা তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তৈরি হচ্ছে 'পবিত্র' (sacred)- এর ধারণা। জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মের প্রতি ভালোবাসা , আদর্শকে অনুসরণ করার তাগিদ তারা একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করছে আন্তরিকভাবে।

ধর্মান্তকরণ বিষয়ের ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে যে তথ্য পেয়েছি তা একেবারে অনুসন্ধিৎসু একজন মানুষের প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে ধর্মান্তকরণের বিষয়কে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কৌতূহল তৈরি হয় স্বাভাবিক ভাবেই। সেটি হল- সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ। সমাজকে জানার এও একটি শৈল্পিক মাধ্যম। বাংলা পদ্য ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'এ শবর জনজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল'কাব্যে কালকেতু ফুল্লরার জীবনচর্চায় সহজে অনুমিত হয় তাদের অনার্য দিনলিপি। প্রাচীন মধ্যযুগের সাহিত্যেআদিবাসীদের কথা উল্লেখ থাকলেও তার পরিসর অল্প। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে এই ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' (১৮৮০-৮২) , শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'শক্তিকানন' (১৮৮৭) , স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' (১৮৮২) উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের কথা পা ই। রবীন্দ্র সাহিত্যে আদিবাসী সমাজে উপেক্ষিত থাকেনি। 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬) ডায়রি, কোপাই, খোয়াই, বাসা, ক্যামেলিয়া, সাঁওতাল মেয়ে প্রভৃতি কবিতায় সাঁওতালদের কথা আছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠি','বলিদান', 'মরণ', 'ঝুমুর' প্রভৃতি গল্পে আদিবাসীদের সংগ্রামী জীবনের কথা পাই। বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আদিবাসী জনজাতির কথা বর্তমান। তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩) , 'কালিন্দী' (১৯৬৪) , 'সপ্তপদী' (১৯৫৮) উপন্যাসে এই জনজাতির কথা আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাস , 'কালচিতি','শিকারী' প্রভৃতি গল্পে অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষদের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' (১৯৪৫) উপন্যাস আদিবাসী জীবনকে অবলম্বন করে লেখা। সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮) উপন্যাস, 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' ছোটগল্পে আদিবাসী সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি চিত্র পাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতপা' (১৯৫৭) , প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী ' (১৯৫৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' (১৯৭০), আব্দুল জব্বারের 'মাতালের হাট ' (১৯৭২), মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮০), মানব চক্রবর্তীর 'ঝাড়খন্ড ও তুতুরির স্বপ্ন ' (১৯৯৪), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঙ ' (১৯৮৮) প্রভৃতি

উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের কথা বিস্তৃত পরিসরে পেয়ে থাকি। এছাড়াও রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' (১৯৫২), 'রেবেকা সোরেনের কবর ' (১৯৫৩), নলিনী বেরার 'ঝাঁটার কাঠি', 'ঝরা পালকের জাদু ', সৈকত রক্ষিতের 'মারাই কল', 'রাঙা মাটি', 'যশোমণি মুর্মু'ইত্যাদি গল্পে আদিবাসী জনজাতি বহুবর্ণে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে।

কিন্তু আমার আলোচনা বিষয় আদিবাসী সমাজের ধর্মান্তরিকরণ। তাই যে লেখায় ধর্মান্তরিকরণের প্রসঙ্গ আছে সেগুলি এখানে আলোচনা করা হলো -

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসের সাথে অল্পবিস্তর আমরা সবাই পরিচিত। এ ই উপন্যাসেআদিবাসী সমাজের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে ধর্মান্তকরণের কোন প্রসঙ্গ নেই। বরং তার 'কালচিতি' ও 'শিকারী' এই দুই ছোটগল্পে ধর্মান্তকরণেরকথা আছে। 'শিকারী' গল্পে আমরা পাই ঝাঁপড়িশোল গ্রামের জংলি দেহাতি ষোলো বছরের বালক মাগনিরামকে। সে তার জঙ্গুলে যাত্রাপথের মধ্যে বরজোর নালা পার হয়ে উপস্থিত হয়েছে চুকুরদি-তুরুকদি রিজার্ভ ফরেস্টে। এই চুকুরদি একটি খ্রিস্টান গ্রাম। গ্রামের মধ্যেই আছে পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গির্জা। সেখানে আছে একটি মাত্র টিনের ভাঙ্গা চেয়ার। যেখানে বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রী সাহেব এসে এই গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে উপাসনা করেন ও শাস্ত্রকথা বলেন। বিবরণ শুধু এটুকুই। কিন্তু আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে প্রত্যন্ত , একেবারে লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন অরণ্য পরিবেষ্টিত আদিবাসী সমাজে যে খ্রিস্টান ধর্ম বহুকাল আগেই প্রসারিত হয়ে গেছে এটি তারই নিদর্শন।

'কালচিতি' গল্পে কালচিতি গ্রামের নারান হাঁসদা এসে কথকদের নিমন্ত্রণ করে গেছে ওদের গ্রামে যাবার জন্য। নারান হাঁসদা সেই গ্রামের প্রধান এবং কথকের মক্কেল। এই সূত্রে কথক সপরিবারে পাড়ি দিয়েছে তার বাসা থেকে ঠিক দশ মাইল দূরে ডিবুডুংরি ও সারোয়া নামের অরণ্য বেষ্টিত দুটি পাহাড় পেরিয়ে কালচিতি গ্রামের উদ্দেশ্যে। এই এই যাত্রাপথে তারা হাজির হয়েছে কারাডোবা নামে একটি বন্যগ্রামে। সেখানে কুড়ি বাইশ ঘর মুন্ডাদের বাস। ধর্মান্তরিত হয়ে আজ তারাখ্রিস্টান। তাদের নতুন নামকরণ হয়েছে পল , রত্ন প্রভৃতি। খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে যে অনেকখানি বাইরের সভ্যতার আলোতে নিয়ে এসেছে একথা কথক অস্বীকার করতে পারেনি।

সিরিল টিগগা , ইমানুয়েল খালখো , জন বেসরা , রিচার্ড টুডু , স্টিফান হোরো- এগুলি সবই সুবোধ ঘোষের লেখা 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ 'গল্পের চরিত্র। এই নামগুলোর দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে যে তারা ধর্মান্তরিত আদিবাসী যুবক।খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার সুবাদে তারা পেয়েছে শিক্ষার সুযোগ। গল্পের প্রেক্ষাপট পাদরিদের স্কুল। এখানেই স্টিফান হোরো পড়াশোনায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, নিউ স্টেটামেন্ট সে জলের মতো আওড়ে গেছে। ফাদার লিণ্ডন সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাকে মেট্রিকুলেশন পাস করার পর দারোগা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখি স্টিফান হোরোর মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বসমাজে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ। মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে চিরকির সাথে সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছে। তাদের সাথে হোরোর মেলামেশাকে মেনে নিতে পারেনি ফাদার

লিন্ডন। অপরদিকে মুন্ডা ডিহির বুড়ো সোখা ভাবে ছেলেধরা পাদরিরা তাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টান করে দিয়েছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে সুসভ্য এই ডাইনদের হাত থেকে রক্ষা করে জঙ্গলের সন্তানকে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। খ্রিস্টান হয়েও স্টিফান সাঁওতাল আখড়াতে মাদল বাজিয়েছে, টাঙ্গি উৎসবে মেতেছে। তাই দেখে ফাদার লিন্ডন আরও তৎপর হয়ে উঠেছে ধর্ম প্রচারে। মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের ডিহিতেই ফাদার মাটির গির্জা তৈরি করেছে। বুড়ো সোখা তা ভেঙেও দিয়েছে। ফলে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে। আট বছর পর গল্পকথক যখন লোপা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তখন সে দেখেছে রুননু হোরোকে। যে সেই দিনই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কথকের চিনতে ভুল হয়নি যে রুননুই তার সহপাঠি একরোখা জেদি মেধাবী স্টিফান হোরো। আজ সে আদিবাসীদের গান্ধী , যীশু খ্রিস্টের মতো দেখতে বিরসার শিষ্য। তার প্রেমিকা চিরকি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হলেও স্টিফান ওরফে রুননু জাতিসত্তার আগুন বুকে নিয়ে বনবাসে চলে গেছে। ধর্ম বদলে শিক্ষা, স্বাচ্ছন্দময় জীবনের সুযোগ পেলেও নিজ সংস্কৃতির প্রতি, শিকড়ের প্রতি টানকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই সে ফিরে গেছে নিজে ধর্মে প্রকৃতি মায়ের কোলে।

রমাপদ চৌধুরীর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’গল্পের প্রেক্ষাপট করানপুরা বা কর্ণপুর। বীরহর , সাঁওতাল গোষ্ঠীর আদিবাসী জনজাতির বাস এখানে। এখানে মাইনিং এজেন্ট ফার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুর সাথে সাঁওতাল কন্যা রূপমতির সম্পর্কের কানাঘুষো তৈরি হয়েছে। কিন্তু তা ছিল একেবারেই অমূলক। রূপমতী ভালবেসেছে সাঁওতাল ললোয়া কুড়ুখকে। ম্যাকু সাহেবের সাথে সম্পর্কের সন্দেহ বশত সমাজের বড়োরা উপরে গোপনে নজর রেখেছে। রূপমতীও সমাজচ্যুত বা বিটলাহা হাওয়ার আশঙ্কা করেছে। ভিখারিয়ারা গান বেধেছে রূপমতীর নামে। গ্রামের পঞ্চায়েত সভায় হাজির করা হয়েছে রূপমতীর বাপ মাধো সরেনকে এবং তার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। ফেউ লাগার মতো গ্রামের ছেলে মেয়েরা রূপমতীর পিছু নিয়েছে। ছড়া কেটে কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিবস্ত্র করে তার গায়ে কাদা দেওয়া হয়েছে। এমতো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেছে ম্যাকু সাহেব। নিয়ে গেছে তাকে বাংলোয়। সেখানে রূপমতীর সান্তনার সহায় হয়েছে ওরাওদের খৃস্টানী মেয়ে মেরিয়া। যাকে ম্যাকুর পিতা ফার্নহোয়াইট রেখেছে রক্ষিতার মতো। রূপমতীর বাবা মাধো সরেনকে একঘরে করেছে সমাজ। সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সাথে কোন জিনিসের লেনদেন করবে না। তাই পকেটে টাকা থাকলেও মাধোর খাবার জোটেনি। অসুস্থতায় সে একাকী পড়ে থেকেছে নিজের ঘরে। ডাইনি রুপমতীর বাবা হওয়ার সুবাদে তাকে শুকিয়ে মরতে হবে। রূপমতী তার সমাজে , প্রেমের মানুষ ললোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে গোপনে বাড়ি ফিরে এসেছে। কিন্তু কেউ তার সহায় হয়নি। ম্যাকু সাহেব রূপমতীকে বিয়ে করবে বলে ধর্ম পরিবর্তন করিয়েছে। রূপমতীর নতুন নাম হয়েছে রেবেকা। সাঁওতাল থেকে সে হয়েছে খ্রিস্টান। কিন্তু ম্যাকু সাহেবের বাবা ছেলের এমন সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা ব্যাঙ্গালোর যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রূপমতী ওরফে রেবেকা চোখের জলে তাদের বিদায় দিয়েছে। ম্যাকু সাহেবও গোপনে চোখের জল মুছেছে। রেবেকার হাতে সে দিয়ে গেছে এক তারা নোট। কিন্তু তারা আর কখনোই ফিরে আসেনি। ম্যাকু সাহেবের সন্তানকে কোলে নিয়ে রেবেকা অপেক্ষা করে গেছে। গির্জার সামনে ছোট একটা ঘরে অনাহারে দিন কাটাতে থেকেছে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে যে তার হাসবাঁধ বা স্বামী ম্যাকু সাহেব ফিরে

আসবে। তার পূর্ব প্রেমিক ললোয়া তাকে নিয়ে পুনরায় ঘর বাধার কথা বললে কিংবা বাল্যসখী সোনামুরি পেট চালানোর জন্য খাদানে কাজ নেওয়ার কথা বললে রূপমতী তার খ্রিস্টানী সত্তাকেই বড় করে দেখিয়েছে। সে এই বিশ্বাস পোষন করেছে যে সাঁওতালি সমাজ থেকে আজ সে অনেক উপরে অবস্থান করে। কিন্তু জীবনের ট্রাজিক পরিণতিতে অপেক্ষাতেই রেবেকা মারা গেছে। তার কবরের ওপর ক্রস পুতে দিয়ে পাদরি সাহেব বাইবেল থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। আর কবরের গায়ে নাম খোদাই করা হয়েছে রেবেকা সোরেনের কবর। এখানে রেবেকার ধর্মান্তরিত হওয়ার পেছনে নিজ সমাজকেই দায়ী করা যায় , সে ফিরতে চেয়েছিল আপন সমাজে, আপন প্রেমিকের কাছে। কিন্তু সমাজের রীতিনীতি , পরম্পরা সে রাস্তাকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসে দেখি দাশু ঘরামি পাঁচ বছর জেল খেটে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মুরলী আপাদমস্তক বদলে গেছে। গির্জাবাড়ির মেয়েদের মত সে শাড়ি পড়েছে। পায়ে তার চটি জুতো। বিছানা যেন তার বাইজি নাচের আসর। স্ত্রীকে দাশু সন্দেহ করে বলে তার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আসল সত্য অন্য। মুরলী সেলাই কাজ করে অর্থ উপার্জন করেছে। হারাণগঞ্জের গির্জাবাড়ির ম্যাম সিস্টার দিদির কাছে সে সেলাই শিখেছে। সিস্টার দিদি তার বাড়িতে এসে খ্রিস্টান শ্লোক শুনিয়েছে। তারই সান্নিধ্যে মুরলী স্বাবলম্বী হয়েছে। সিস্টার দিদি তাকে পড়াশোনা শেখানোর কথাও বলেছে। কিন্তু দাশুর কোন পরিবর্তন হয়নি। সে তার সমাজেই মাটির সাথে মিশে থাকতে চেয়েছে। জমি চাষ করেই জীবন চালিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু মুরলীর মধ্যে দেখা দিয়েছে অগাধ পরিবর্তন। সে আর কিষানী হতে চাইনি। দাশু আশঙ্কাভরে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে –"তোর কি খিরিস্তান হবার সাধ হয়েছে ?"[৮]উত্তরে মুরলী বলেছে –"হলে ভালো হয়"।[৯] দাশু অনুভব করে তার স্ত্রী মুরলী পাঁচ বছরে তার অবর্তমানে মেমসাহেব হয়ে গেছে। সিস্টার দিদির নির্দেশে মুরলী তার স্বামীর সাথে স্বাভাবিক আবেগে দৈহিক সম্পর্কে যেতে পারেনি। অপেক্ষা করেছে কবে সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। আর সিস্টার দিদির পরামর্শ অনুযায়ী কলের কাজ গ্রহণ করবে। এই পাঁচ বছরে মুরলী নিজে সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। করম নাচেও সে অংশগ্রহণ করেনি। পরবের দিনে হাড়িয়া খায়নি। এ সবকিছুর পেছনে আছে সিস্টার দিদির নির্দেশ। অবশেষে তাদের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে বিচ্ছেদ। যার কারণ রূপে দেখা দিয়েছে ধর্মান্তর।

প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী 'উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সুদূর পূর্ব ভারত। নাগাল্যান্ড। এই উপন্যাস দেখি খ্রিস্টান মিশনারীরা নাগা উপজাতির মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছে লবণ , অর্থ আর পোশাকের বিনিময়ে। যদিও এই ধর্ম প্রচারের নেপথ্যে শুধুই যে ধর্মীয় আদর্শ ছিল তা নয়। ছিল রাজনৈতিক গোপন অভিসন্ধি। যা ছিল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী মিশনারীদের খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। উপন্যাসে দেখি পাদরি সাহেব মিস্টার ম্যাকেঞ্জী পুলিশ সুপার মিস্টার বসওয়েলকে সাথে নিয়ে ধর্মকে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকেই পূর্ণতা দিতে চেয়েছে। পাহাড়ের বুনো আদিবাসীদের সমতলের মানুষের সাথে বিভেদ তৈরি করতে চেয়েছে। ম্যাকেঞ্জীর এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে পিয়ারসন সাহেব , যে ভারতে এসেছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সে প্রতিবাদ করেছে। ম্যাকেঞ্জী সাহেব আদিবাসীদের সবরকম সাহায্য করতে

চেয়েছে। বিনিময়ে শুধু চেয়েছে ধর্মীয় আনুগত্য। আর এই নির্দেশকেই প্রশ্নহীন আনুগত্যে অনুসরণ করেছে সিজিটো। পাদরীসাহেবম্যাকেঞ্জীধর্মপ্রচারকে সহজ করার জন্য সালুয়ালাঙ , কেলুরি প্রভৃতি বস্তির সর্দারদের হাত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখি আন্তরিকতাশূন্য মহৎ উদ্দেশ্যহীন ম্যাকেঞ্জী সাহেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ধর্মান্তরিকণ সম্পর্কে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে এই বিষয়ে চার্চের কোন জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া মানসিকতা নেই। আদিবাসী সমাজ প্রয়োজন মনে করেই স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ধর্ম বদল করে তারা পাচ্ছে তার প্রায় সবই আছে সরকারিভাবে। যেমন , শিক্ষার নিশ্চয়তা , স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা , সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। কিন্তু তারপরও কোথাও ফাঁক থেকে গেছে। আদিবাসী সমাজের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু হলেও তা সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছছে কিনা তা দেখার সঠিক কোন নিয়ম নেই। নিয়ম থাকলেও তা সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা সন্দেহ তৈরি করে। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে চার্চ নব দীক্ষিত সমাজের ওপর ধর্মীয় নিয়ম কানুন প্রচলনে যতটা নমনীয় হয়েছে তাতে মনে হয়েছে তাদের লক্ষ্য ধর্মান্তরিত প্রজন্ম নয়। তাদের মূল লক্ষ্য ধর্মান্তরিত প্রজন্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম। যারা জন্মসূত্রেই খ্রিস্টান এই ধর্মীয় পরিচয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র:

১) বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ,পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খন্ড) , বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা ৭০০৪০০, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৭, পৃ. ১
২) তদেব পৃ. ১-২
৩) তদেব পৃ. ১৮৬
৪) তদেব পৃ. ১৮৬
৫) ঘোষ, সুবোধ, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ - ১৩৫৫, পৃ. ২২
৬) তদেব পৃ. ২৪
৭) ঘোষ, শান্তনু, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) , চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮, পৃ. ৩৯
৮) ঘোষ, সুবোধ, শতকিয়া, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ২০
৯) তদেব পৃ. ২০